র‍্যাণ্ডি পশ মারা গেছেন

মীজান রহমান

র‍্যাণ্ডি পশ মারা গেছেন।

র‍্যাণ্ডি পশের নাম শোনেননি বুঝি ? না শোনারই কথা। আজকাল পত্রিকা পড়ে কে ? টিভিতে এদেশের খবরই বা দেখে ক'জন ? এতগুলো দেশি চ্যানেল থাকতে বিদেশি খবর দেখবার গরজই বা কার। কিন্তু র‍্যাণ্ডি পশের জীবন আর দশটা মানুষের মত ছিল না। তাঁর মৃত্যুও আর দশটা মানুষের মৃত্যুর মত নয়। তাঁর গল্প আমাকে নাড়া দিয়েছে। হয়ত আপনাকেও দেবে। সেই আশাতেই লিখছি।

পেশাতে ডক্টর পশ ছিলেন কম্পিউটার বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পিট্‌স্‌বার্গের বিখ্যাত কার্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করার পর সেখানেই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রমহলে তাঁর ছিল ঈর্ষণীয় সুনাম ও জনপ্রিয়তা। অত্যন্ত দুরূহ ও দাঁতভাঙা বিষয়গুলোকে হাস্যরস আর কৌতুকের মাধ্যমে সহজবোধ্য ও উপভোগ্য করে তুলবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। র‍্যাণ্ডি পশের বিশেষত্ব ছিল কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি অত্যাধুনিক শাখাতে, যার নাম ভার্চুয়েল রিয়েলিটি। (শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। আক্ষরিক তরজমাতে 'আপাতবাস্তব' বলা যেতে পারে। কিন্তু সেটা আমি বলবার কে। আমি তো আর ভাষাবিদ নই।) এই বিষয়টিতে র‍্যাণ্ডি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। কার্নেগীর কম্পিউটার বিজ্ঞান অনুষদে বিনোদন প্রযুক্তি কেন্দ্রের তিনি ছিলেন যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর উদ্যোগে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্যে নতুনধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, যার ফলে বিষয়টি ভীষণ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ছাত্রসমাজে। তাঁর ক্লাসরুমে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্যে ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। র‍্যাণ্ডি পশ ছিলেন সব শিক্ষকের সেরা শিক্ষক, সব গবেষকের সেরা গবেষক।

কিন্তু র‍্যাণ্ডি পশের সত্যিকার ধনদৌলত হয়ত তাঁর অধ্যাপনাতে ছিল না, গবেষণাগারেও নয়, ছিল তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে। তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর অন্তরময় মানুষ। অবিশ্বাস্যরকম চিত্তসম্পদের অধিকারী ছিলেন এই লোকটা।

কার্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের একটি অংশ হল, প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ নতুন সেশন শুরু হবার সাথে সাথে, একটা ব্যতিক্রমী বক্তৃতার আয়োজন করা। বক্তৃতাটির শিরোনাম ঃ দ্য লাস্ট লেকচার—শেষ বক্তৃতা। মূল কথাটি হল যে বক্তাকে একটা কাল্পনিক পরিস্থিতি দাঁড় করাতে হবে যেখানে তাঁর মৃত্যু আসন্ন হয়ে গেছে, এবং এই বক্তৃতাই হবে তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা। সে-অবস্থায় তিনি বৃহত্তর মানবজাতির জন্যে, বিশেষত তাঁর পরিচিত পরিবেশের মানুষদের জন্যে, কি বাণী রেখে যাবেন, কি দুর্মূল্য প্রজ্ঞা বিচ্ছুরিত হবে তাঁর জীবনান্তিক ভাষণে, তা'ই হল এ-বক্তৃতার মুখ্য বিষয়। এ-বক্তৃতা দেবার জন্যে প্রতিবছর একজন বিশিষ্ট অধ্যাপককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০০৭ সালে এই আমন্ত্রণপত্র পৌঁছালো র‍্যাণ্ডি পশের কাছে।

সবই গতানুগতিক। ঐতিহ্যের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি কোনখানে। র‍্যাণ্ডি পশ অত্যন্ত সফল অধ্যাপক, কৃতী গবেষক, বিপুল জনপ্রিয়তা। তাঁর চেয়ে যোগ্য বক্তা আর কাকে পাবে তারা। শুধু একটাই ব্যতিক্রম ছিল সমস্ত ঘটনাটিতে। র‍্যাণ্ডিকে তাঁর আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করতে হয়নি। সত্যিকারের মৃত্যুই তখন তাঁর দুয়ারে। একবছর আগে ডাক্তারের চূড়ান্ত রায় পেয়েছিলেন তিনি। বেশি সময় নেই তাঁর। দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। প্যাংক্রিয়াসের ক্যান্সার থেকে সাধারণত কারুরই উদ্ধার নেই। তাঁর ক্যান্সার এতটাই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল যে কোন চিকিৎসাতেই সেটাকে সারাবার সাধ্য ছিল না কারো।

র‍্যাণ্ডি পশ সানন্দে গ্রহণ করলেন সেই আমন্ত্রণ। এত বড় সম্মান কি পায়ে ঠেলা যায় ? মস্ত বড় ভুল হবে গ্রহণ না করলে। তাছাড়া এর চেয়ে সহজ কাজ আর কি হতে পারে। অন্যান্য বক্তাদের কল্পনা করে, সত্যমিথ্যার মিশেল দিয়ে, অনেক কষ্ট করে বক্তৃতা তৈরি করতে হয়। তাঁকে কিছুই করতে হবে না। মৃত্যু নিজেই তা প্রস্তুত করে রেখেছে তাঁর জন্যে। ডাক্তারের সেই বজ্রঘোষণা শোনার পর তো তাঁর মনে অনেক কথাই তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। তার একাংশও যদি অন্য কাউকে শোনাবার সুযোগ হয় তাহলে তো পরম সৌভাগ্যের কথা। সংসারে ক'জন মুত্যুগামী মানুষের জীবনে অতবড় ভাগ্য আসে।

সারা মিলনায়তনে শ্রোতার সমুদ্র। দাঁড়াবার জায়গাও ভরাট। বক্তা হিসেবে এমনিতেই তাঁর নাম, তার ওপর এই নিদারুণ সংবাদ। এ-সুযোগ হাতছাড়া করবে কে। এ তো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকার মত। সংসারে ক'জন মানুষ পাওয়া যাবে যারা তাদের বংশধরদের কাছে গল্প করতে পারবে যে তারা সশরীরে উপস্থিত ছিল সেই ঐতিহাসিক লাস্ট লেকচারটিতে যেখানে বক্তা নিজেই জানতেন যে এটা সত্যি সত্যি তাঁর শেষ বক্তৃতা, তাঁর সময় ফুরিয়ে গেছে ? এমন আশ্চর্য ঘটনা তো কল্পনা করাও শক্ত।

র‍্যাণ্ডি পশ বক্তৃতা মঞ্চে এলেন। মনমরা, বিমর্ষ ভাব নিয়ে নয়। ধীরপায়ে, মন্থর গতিতে নয়। তাঁর চিরাচরিত দ্রুত, দৃপ্ত পদক্ষেপে। হাস্যোজ্জল মুখাবয়বে। ক্লাসে ছাত্র পড়ানোর সময় যেমন হাসিখুশি, চট্‌পটে ও প্রাণোচ্ছল মানুষ, অবিকল সেই একই মানুষ তিনি। আসন্ন

মৃত্যুর ভাবনায় সামান্য মেঘের ছায়া যদিবা ঘনিয়ে থাকে কোথাও তার সমস্ত ছাপ তিনি মুছে ফেলেছিলেন মুখ থেকে। শ্রোতারা বিপুল করতালিতে তাঁকে স্বাগতম জানাল। তারপর একটি হৃদয়বিদারক ভাষণের অপেক্ষায় তারা মৌন গাম্ভীর্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকল। র‍্যাণ্ডি পশ এক মুহূর্ত চুপ থেকে পুরো হলটা পরীক্ষা করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকভরা দৃষ্টিতে। যেন জিজ্ঞেস করছেন সবাইকে, আপনারা সবাই এত গুরুগম্ভীর হয়ে বসে আছেন কেন ? কেউ মারা গেছে নাকি ? তারপর ফিক করে একগাল হেসে বললেন, আপনারা যদি আশা করে থাকেন যে আমি একটা মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনী শোনাব আজকে তাহলে, বন্ধুগণ, আমি দুঃখিত যে আপনাদের হতাশ করতে হবে আমায়। কারণ আমার মৃত্যু আসন্ন বলেই আমি আজকে মৃত্যুর কথা বলব না। বরং মৃত্যু আমার আসন্ন বলেই আজকে আমি মৃত্যুর কথা বলব না, বলব জীবনের কথা। জীবন যে কত সুন্দর, কত আনন্দের, তারই জয়গান করব আমি। আমি বলব স্বপ্নের কথা, বলব সৃষ্টির কথা, বলব উৎসব আর উল্লাসের কথা।

এইভাবে শুরু করে তিনি শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখলেন পুরো একটি ঘণ্টা। তিনি ওদের হাসালেন, কাঁদালেন, ভাবালেন। তিনি নিজেকে নিয়ে কৌতুক করলেন, নিজের মৃত্যুভয়কে ব্যঙ্গ করলেন, মঞ্চের পেশাদার কৌতুকাভিনেতারা যেমন করে। মানুষ তাঁর কপট ভাঁড়ামিতে হাসল। মানুষ তাঁর প্রদীপ্ত অন্তর্জ্যোতির স্পর্শ পেয়ে ধন্য হল। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হল। তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি তাদের অনুপ্রাণিত করল এগিয়ে চলবার। তিনি বললেন যে মানুষের স্বপ্নসিদ্ধির দায়িত্ব কোনও অদৃশ্য ভাগ্যদেবতার নয়, তার নিজেরই। সে নিজেই তার জীবনের নির্মাতা, স্থপতি। জীবনকে সুন্দর করতে হলে সুন্দরের সাধনা করতে হবে আজীবন কঠোর পরিশ্রম দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে। ভাগ্য তাকেই বলে যার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। যা অলক্ষ্যে তার হাতে একপাতি তাস রেখে উধাও হয়ে যায়। সে-তাসের কোন্‌টার কি রং কি ওজন তার ওপর মানুষের কোনও প্রভাব নেই। প্রভাব আছে সে-কার্ডকে কিভাবে খেলতে হয় তার ওপর। সেই জন্মসূত্রে-পাওয়া তাস খেলার নামই জীবন। কে কতটা ভাল খেলোয়াড় তার ওপরই নির্ভর করে জীবন কতটা সাফল্যময়।

বক্তৃতাটি মানুষকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে ওটার তাৎক্ষণিক চলচ্চিত্র তো তৈরি হয়েছেই, উপরন্তু উপস্থিত এক সাংবাদিক সেখানেই সিদ্ধান্ত করে ফেললেন যে এই বক্তৃতার অবলম্বনে একটা পূর্ণাঙ্গ বই লিখবেন। মোটমাট ৫৩ দিন ধরে র‍্যাণ্ডি পশের সাক্ষাৎকার নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন ভদ্রলোক তার নামই হল 'দ্য লাস্ট লেকচার'। বইটি মুদ্রিত আকারে বের হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্‌লাইনে প্রকাশ পাওয়ার পর এর জনপ্রিয়তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীসুদ্ধ তরুণতরুণী যুবাবৃদ্ধ 'দ্য লাস্ট লেকচার' নিজের কানে শোনার জন্যে কান পেতে থেকেছে।

মৃত্যুকালে র‍্যাণ্ডি পশের বয়স ছিল ৪৭ বছর। এই সময়টুকুতে তিনি মননে মানসে অর্জন করেছিলেন সীমাহীন সম্পদ, কিন্তু তার চেয়ে শতগুণ সম্পদ তিনি রেখে গেছেন মানবজাতির জন্যে।

* * * *

বিদগ্ধ পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, এরকম ঘটনা কি পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি কখনো ? নিশ্চয়ই ঘটেছে। সব দেশে সব যুগেই এমন দু'চারজন মানুষ জন্ম নেয়। জন্ম নেয় বলেই এতকিছুর পরও পৃথিবীটা এখনো বাসের অযোগ্য হয়ে যায়নি পুরোপুরি। তবুও যতবার শুনি র‍্যাণ্ডি পশের মত গল্প ততবারই আমাদের নির্জীব-হতে-থাকা মন যেন নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে যায়। নৈরাশ্যের নিকষ অন্ধকারেও কেমন করে যেন জোনাকির মত জ্বলে ওঠে মাটির প্রদীপ। আজকে আমার প্রচুর বয়স হয়েছে। মৃত্যুর ভাবনা বারবারই উঁকি দেয় মনে। তা নাহলে ডাক্তারের অফিসে বসে এত সময় নষ্ট করব কেন ? কিন্তু সেটা কি মৃত্যুর ভয় ? জানি না। বিশ্বাস করতে ভাল লাগে যে আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, কিন্তু কে জানে, তার পরীক্ষা তো কখনো দিতে হয়নি আমাকে। তবে যাকে আমি সত্যি সত্যি ভয় পাই সে হল মৃত্যুর ভয়। মৃত্যুভয় যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমি নিজেই দেখেছি। তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগে মনে। এটা আল্লার ইচ্ছায় এসেছে আমার মনে, না, শয়তানের ইচ্ছায় সেটা আল্লামালিক ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রশ্নটা হল এই। আচ্ছা, যদি মৃত্যু বলে কোন জিনিস না থাকত ইহজগতে তাহলে কি ঈশ্বরবন্দনার কোন প্রয়োজন থাকত ? তার চেয়েও উদ্ধত প্রশ্ন ঃ তাহলে কি ঈশ্বর নামক কোনও অশরীরি সত্তার অনুভব সৃষ্টি হত মানুষের মনে ? আর ঈশ্বর যদি না থাকতেন তাহলে তো ধর্মের অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছেন কি নেই তা প্রমাণের ব্যাপার নয়, বিশ্বাসের ব্যাপার। তবে আমি তাঁর অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না করি, তাঁর অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে ঈশ্বর যদি না'ও থাকতেন তাহলেও মানুষকে একটি ঈশ্বর আবিষ্কার করে নিতে হত তার নিজেরই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। কথাটির সঙ্গে আমি একমত। এবং সেই প্রয়োজনটার উদ্ভব হয়েছে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা থেকে। মৃত্যু আছে বলেই জীবনের জন্যে মানুষের এত মায়া। এমনই মায়া যে মৃত্যুর ভয় অনেক মানুষকেই একেবারে মুহ্যমান করে ফেলে, তাকে ভিন্ন মানুষে পরিণত করে। দু'চারজন দারুণরকম প্রগতিশীল মানুষকে আমি জানি যারা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মূর্খ মোল্লার কাছে তৌবা করেছে, দোয়া চেয়েছে আল্লার কাছে সব গুনাহ্ মাফ করার জন্যে। সারাজীবন যারা নিজেদের পাঁড় নাস্তিক বলে দাবি করেছে, তারাও মৃত্যুর মুখে

সব ভুলে গিয়ে ধর্মের শরণাপন্ন হয়। এটা কি দুর্বলতা ? অবশ্যই দুর্বলতা। এটা কি স্বাভাবিক ? অবশ্যই স্বাভাবিক। অসাধারণ মনোবল আর অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাস যাদের নেই—এবং আমাদের অধিকাংশেরই তা নেই—তারা তো ভেঙে পড়বেই মৃত্যুর মত এক ভয়াবহ দৈত্যের মুখোমুখি হয়ে। মৃত্যুর মত শক্তিশালী জিনিসকে চ্যালেঞ্জ করে তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি ক'জনের আছে ?

র‍্যাণ্ডি পশের ছিল। তাঁর কি মৃত্যুর ভয় ছিল না একেবারেই ? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেই ভয়কে তিনে জয় করতে পেরেছিলেন মনের জোরে। মৃত্যুকে তিনি যত ভয় পেতেন তার চেয়েও তীব্রভাবে ভালবাসতেন তিনি জীবনকে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে ছিল একেকটি পূর্ণ জীবনের মত যাকে কোনক্রমেই অপচয় করা যায় না। বিশেষরকম মূল্যবান ছিল তাঁর শেষ মুহূর্তগুলো, সময় নামক নিষ্ঠুর বিধাতার শেষ বরাদ্দটুকু। সেই অমূল্য মুহূর্তগুলোকে তিনি নষ্ট করতে চাননি দুর্বলের আত্মশোচনায় বা অর্থহীন অনুশোচনায়। তাঁর সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে নিবেদিত ছিল জীবনদেবতার নিরন্তর বন্দনাতে। জীবন বলতে তিনি কি বুঝতেন ? বুঝতেন আনন্দ, সুন্দর, নির্মল খেলা, সৃষ্টি, ভালবাসা। এগুলোই তাঁর জীবন, তাঁর ইশ্বর। তাই মৃত্যুর আকস্মিক আগমন তাঁকে পঙ্গু না করে বরং ঋজু করেছে। দুর্বলতা যা ছিল তা দূর করে নতুন শক্তিতে ভরে দিয়েছে। একেই আমি বলি জীবনবাদ। এই জীবনবাদই আমার শেষ জীবনের একমাত্র আরাধ্য। আমার শেষ মুহূর্তগুলো যেন র‍্যাণ্ডি পশের মতই উৎসব ও আনন্দধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি যেন মৃত্যুর ভয়ে তক্তপোশের কোণাতে বসে কাঁপতে না থাকি। সর্বোপরি, আমার জীবনের সকল অর্জিত বিশ্বাসকে যেন জলাঞ্জলী দিতে না হয় মৃত্যুর পদমূলে।

অটোয়া,
২ আগস্ট, ২০০৮
মুক্তিসন ৩৭